

## ভূমিকা

কীভাবে এলাম আমরা? এই অসীম মহাবিশ্ব, কিংবা সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি- এগুলোই বা কেমন করে হলো? সবকিছুই কি একজনের ইশারায় একটি নির্দিষ্ট কারণে সৃষ্টি হয়েছে? কৌতূহলী মানুষ সহস্র বছর ধরে সন্ধান করছে এমন সব প্রান্তিক প্রশ্নের উত্তর। ক্ষুদ্র জীবনের সর্বক্ষণ চিন্তিত না থাকলেও প্রশ্নগুলোর কাঁপুনি সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমরা সবাই অনুভব করেছি। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধান নিয়োজিত ছিলো প্রথাগত দর্শন। বিজ্ঞান বসে ছিলো সাইড লাইনে, সেই ঘোড়দৌড় উপভোগকারী হাজার দর্শকের একজন হিসেবে। কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। প্রান্তিক এই সমস্যাগুলোর অনেকগুলোরই নিখুঁত সমাধান হাজির করতে পারে বিজ্ঞান। গতানুগতিক দর্শন নয় বরং বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দার্শনিকরাই আজ গহীন আঁধারের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। আজকের দিনে কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিকের নাম বলতে বললে হকিং, ওয়াইনবার্গ, ভিকটর স্টেঙ্গর, ডকিন্স- এদের কথা সবার আগেই চলে আসে। এরা কেউ প্রথাগত দার্শনিক নন, কিন্তু তবুও দর্শনগত বিষয়ে তাদের অভিমত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সবসময়ই দর্শন আমাদের জ্ঞান চর্চার মধ্যমণি। কিন্তু প্রথাগত দর্শনের স্বর্ণযুগে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ছিলো তার সহচরী। এখন দিন বদলেছে- বিশ্বতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব এমন কি অধিবিদ্যার জগতেও প্রাকৃতিকবিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা শুধু প্রবেশ করে নি, প্রথাগত দর্শনকে প্রায় স্থানচ্যুত করে দিয়েছে। অধিবিদ্যা জানতে হলে তো এখন আর ‘স্পেশাল কোনো জ্ঞান’ লাগে না। কেবল ধর্মের ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব আর ভাষার মধ্যে আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোনো পথ পায়নি আধুনিক অধিবিদ্যা এবং প্রথাগত দর্শন। অন্যদিকে, আধুনিক পদার্থবিদ্যা আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছে- সেটি অধিবিদ্যার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে। আমরা আজ জানি, মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর পরিণতি নিয়ে একজন প্রথাগত দার্শনিক কিংবা বেদ জানা পণ্ডিত কিংবা কোরান জানা মৌলভির চেয়ে অনেক শুদ্ধভাবে বক্তব্য রাখতে সক্ষম হবেন একজন হকিং কিংবা ওয়াইনবার্গ। ডিজাইন আর্গুমেন্ট নিয়ে অধিবিদ্যার গবেষকের চেয়ে বিজ্ঞান থেকেই অনেক ভালো দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন ডকিন্স বা শন ক্যারল। আজকে সেজন্য মহাবিশ্ব এবং এর দর্শন নিয়ে যেকোনো আলোচনাতে পদার্থবিজ্ঞানীদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়, অ্যারিস্টটলের ইতিহাস কপচানো কোনো দার্শনিককে কিংবা সনাতন ধর্ম জানা কোনো হেড পণ্ডিতকে নয়। মানুষও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নানা রকমের দর্শনের কথা শুনতে চায়, তাদের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের দর্শন এবং চেতনার কথাগুলো বাঙালি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি, যে দর্শন মহাবিশ্ব এবং জীবনের প্রান্তিক সমস্যাগুলোর সমাধানে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এবং ধর্ম ও প্রথাগত দর্শনকে তার আগের অবস্থান থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

আমরা, এ বইয়ের দু’জন লেখকের কেউই প্রথাগত দার্শনিক নই। বরং আমাদের পেশাগত এবং অ্যাকাডেমিক জীবনে খুব কঠোরভাবেই বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। বিজ্ঞান এবং এর কারিগরি প্রয়োগ নিয়েই আমাদের কাজ কারবার। কাজেই আমরা আমাদের ‘বিজ্ঞানের চোখ’ দিয়েই প্রান্তিক সমস্যাগুলোকে দেখেছি। পাশাপাশি বহুদিন ধরেই মুক্তমনাসহ বিভিন্ন রুগে জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান, বিবর্তন, মানবতাবাদ, সংশয়বাদ, যুক্তিবাদসহ বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রান্তিক সমস্যাগুলো নিয়ে লিখছি। বহু গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, এবং সংকলন সাময়িকীতে আমাদের ধ্যান ধারণা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি সেসব ধারণারই সুসংবদ্ধ এবং সুগ্রন্থিত প্রতিফলন। আমাদের এই বইটি অবিশ্বাস নিয়ে, এর অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে। আমরা দু’জনেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস মুক্ত এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। কেন অবিশ্বাসী, তার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখানোই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এ বিশ্লেষণ আমাদের

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত মনগড়া কোনো গল্প নয়, বরং তা হাজির করা হয়েছে একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সাম্প্রতিক তথ্যের নিরিখে। আমাদের এই গ্রন্থে ঈশ্বর ছাড়াই কীভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক তত্ত্ব এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা খুব জোরালোভাবে সমর্থিত। এছাড়াও মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে একটি আদি ঐশ্বরিক কারণ খণ্ডন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে কোনো ধরনের অলৌকিকতার উপস্থিতির অপ্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা ছাড়াও পদার্থের উৎপত্তি এবং শৃঙ্খলার সূচনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাণের উৎপত্তি থেকে শুরু করে বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে আমাদের বইয়ে। পাঠকেরা এই বইয়ের পথপরিক্রমায় জানতে পারবেন, মহাবিশ্ব কিংবা প্রাণ- কোনো কিছুর উৎপত্তির ব্যাখ্যাতেই ঈশ্বরকে হাজির করার প্রয়োজন আজ আর পড়ে না। এর পাশাপাশি, আমরা আধুনিক জ্ঞানের নিরিখে সুচারুভাবে খণ্ডন করেছি ‘প্যালের ঘড়ি’ এবং হয়েলের ‘টার্নেডো থেকে বোয়িং’ নামের ছদ্মবৈজ্ঞানিক ধারণাকে। জীবজগতের ডিজাইন এবং ব্যাড- ডিজাইন নিয়েও আলোচনা করেছি নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে। শুধু তাই নয়, এই বইয়ে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উৎসেরও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি যে, নাকের সামনে ‘স্বর্গের মূলো’ ঝোলাবার কারণে নয়, বরং ডারউইনীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবেই পরার্থপরায়ণতা, সহযোগিতা, নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মতো অভিব্যক্তিগুলো জীবজগতে উদ্ভূত হতে পারে, যা বিবর্তনের পথ ধরে মানব সমাজে এসে আরো বিবর্ধিত আর বিকশিত হয়েছে। আমরা আশা করি, এ বইটি একজন সচেতন পাঠককে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতাই যে একজন বুদ্ধিমান মানুষের সবচেয়ে যৌক্তিক অবস্থান হতে পারে তা বোঝাতে সক্ষম হবে। সে কথা মাথায় রেখেই এ বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে ‘অবিশ্বাসের দর্শন’। এই বইটির নাম ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ যেমন হয়েছে, তেমনি এ বইয়ের নাম অবলীলায় হতে পারতো ‘অবিশ্বাসের বিজ্ঞান’, কিংবা ‘প্রান্তিক বিজ্ঞান’। কারণ আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের চোখ দিয়েই দর্শনের প্রান্তিক সমস্যাগুলোকে দেখেছি, ঠিক যেমন স্টিফেন হকিং তার পদার্থবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে দর্শনের প্রান্তিক সমস্যা আর আমাদের অস্তিত্বের রহস্য নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন তার অতি সাম্প্রতিক ‘গ্র্যান্ড ডিজাইন’<sup>1</sup> বইয়ে, কিংবা জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স করেছেন তার ‘গড ডিলুশন’ বইয়ে<sup>2</sup>।

বিশ্বাস এবং ধর্ম সবসময়ই একে অন্যের পরিপূরক, আমাদের সমাজে তো বটেই, পাশ্চাত্যেও। আর এ নিয়ে বহু খ্যাতনামা দার্শনিকই চিন্তাভাবনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। স্পিনোজা থেকে ভলতেয়ার, ফুয়েরবাক থেকে মার্ক্স পর্যন্ত অনেকেই ভেবেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মডেলও তুলে ধরা হয়েছে অনেক। বাংলা ভাষায়ও খুব বেশি না হলেও বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, লিখেছেন হুমায়ুন আজাদ, লিখেছেন আহমদ শরীফ, লিখেছেন প্রবীর ঘোষ কিংবা ভবাণীপ্রসাদ সাহু। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের দার্শনিকেরা বিভিন্নভাবে ধর্মবিশ্বাস এবং সমাজে এর প্রভাবকে বিশ্লেষণ করলেও আমরা মনে করি রিচার্ড ডকিন্সের ‘ভাইরাসেস অব দ্য মাইন্ড’ রচনাটির আগে জৈববৈজ্ঞানিকভাবে ধর্মের মডেলকে বোঝা যায়নি<sup>3</sup>। এই প্রবন্ধ থেকে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতিনীতিগুলো অনেকটা ফ্লু-ভাইরাসের মতোই আমাদের সংক্রমিত করে। সেজন্যই ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ বহু কিছুই করে ফেলে, যা সুস্থ মস্তিষ্কে কল্পনাও করা যায় না। বিখ্যাত বিজ্ঞানের দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট, ডকিন্সের এই ধারণাকেই আরো সম্প্রসারিত করে একটি বই লিখেছেন সম্প্রতি- ‘ব্রেকিং দ্য স্পেল’ শিরোনামে<sup>4</sup>। একই ভাবধারায় ড্যারেল রে সম্প্রতি লিখেছেন ‘গড ভাইরাস’<sup>5</sup>। রিচার্ড ব্রডি লিখেছেন

1 Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam; 1St Edition edition (September 7, 2010)

2 Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006

3 Richard Dawkins, Viruses of the Mind, available online: <http://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html>

4 Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Penguin, 2007

5 Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press, 2009

‘ভাইরাস অব দ্য মাইন্ড’<sup>6</sup> প্রভৃতি। ডকিঙ্গ নিজেও ভাইরাস সংক্রমণের ব্যাপারগুলোকে মিম তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। ‘সেলফিশ জিন’<sup>7</sup> এবং সাম্প্রতিক ‘গড ডিলুশন’ বইয়ে তার সেসমস্ত ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য সেসব বই সংগ্রহ অনেকটাই দুরূহ। আমরা আশা করছি, আমাদের এই বইয়ের মাধ্যমে সেসব সাম্প্রতিক ধ্যান ধারণাগুলোর সাথে তারা পরিচিত হতে পারবেন। তবে, পাঠকেরা উপলব্ধি করবেন যে, আমরা এই বইয়ে ডকিঙ্গের ‘মিম’ এর বদলে ভাইরাস শব্দটিই অনেক বেশি ব্যবহার করেছি। এর কারণ হচ্ছে, ভাইরাস ব্যাপারটির সাথে সাধারণ পাঠকেরা পরিচিত, ‘মিম’ এর সাথে তেমনটি নয় এখনো। যেকোনো গতানুগতিক ধর্মে বিশ্বাস যে মানুষের মনে একটি ভাইরাস হিসেবেই কাজ করে সেটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’ নামের অধ্যায়ে। আমরা এই বইয়ে উল্লেখ করেছি, মানবমনে প্রোথিত বিশ্বাসগুলো আসলে অনেকটাই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো কাজ করে। এদের আক্রমণে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার বহু উদাহরণ আছে বিজ্ঞানীদের কাছে। যেমন-

নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম নামে এক ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট ঘাসফড়িং-এর মস্তিষ্কে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাসফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, যার ফলে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্মের প্রজননে সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারী ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যা পরিচালিত করে<sup>8</sup>।

জলাতঙ্ক রোগের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পাগলা কুকুর কামড়ালে আর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেলে। ফলে আক্রান্ত মস্তিষ্কের আচরণও পাগলা কুকুরের মতোই হয়ে ওঠে। আক্রান্ত ব্যক্তি অপরকেও কামড়াতে যায়। অর্থাৎ, ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

ল্যাংসেট ফ্লুক নামে এক ধরনের প্যারাসাইটের সংক্রমণের ফলে পিঁপড়া কেবল ঘাস বা পাথরের গা বেয়ে উঠা নামা করে। কারণ এই প্যারাসাইটগুলো বংশবৃদ্ধি করতে পারে শুধুমাত্র তখনই যখন কোনো গরু বা ছাগল একে ঘাসের সাথে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ফলে প্যারাসাইট নিরাপদে সেই গরুর পেটে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে<sup>9</sup>।

নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম যেমনিভাবে ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যা পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি ধর্মের বিভিন্ন বাণী এবং জিহাদি শিক্ষা মানুষকে অনেকসময়ই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো সংক্রমিত করে আত্মঘাতী করে তুলে। ফলে আক্রান্ত সন্ত্রাসী মনন বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে টুইন টাওয়ারের উপর, কখনোবা সিনেমা হলে, কখনোবা রমনার বটমূলে। নাইন ইলেভেনের বিমান হামলায় উনিশজন ভাইরাস আক্রান্ত মনন ‘ঈশ্বরের কাজ করছি’ এই প্যারাসাইটিক ধারণা মাথায় নিয়ে হত্যা করেছিলো প্রায় তিন হাজার সাধারণ মানুষকে। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর অধ্যাপক ব্রুস লিংকন, তার বই ‘হলি টেররসঃ থিংকিং অ্যাবায়ুট রিলিজিয়ন আফটার সেপ্টেম্বর ইলেভেন’ বইয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে বলেন, ‘ধর্মই, মুহাম্মদ আতাসহ আঠারজনকে প্ররোচিত করেছিল এই বলে যে, সংগঠিত বিশাল হত্যাযজ্ঞ শুধুমাত্র তাদের কর্তব্য নয়, বরং স্বর্গ থেকে আগত পবিত্র দায়িত্ব’<sup>10</sup>। হিন্দু মৌলবাদীরাও একসময় ভারতে রামজন্মভূমি অতিকথনের ভাইরাস বুরে লালন করে ধ্বংস করেছে শতাব্দী প্রাচীন বাবরি মসজিদ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় অপবিশ্বাসের অপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘ধর্মীয় নৈতিকতা’, এবং এর পরবর্তী ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’ অধ্যায়টিতে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, পৃথিবীতে শান্তি আনার পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টিতেই

6 Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House; Reprint edition, 2009

7 Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976

8 Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, August 2005

9 এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

10 Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, University Of Chicago Press; 1 edition, 2003

যুগযুগ ধরে অবদান রেখেছে ধর্মগুলো, হয়ে উঠেছে বিভেদের হাতিয়ার। এই বইয়ে বহু পরিসংখ্যান হাজির করে দেখানো হয়েছে যে, ধর্ম নৈতিকতার একমাত্র উৎস নয়, কিংবা নাস্তিক হলেই কেউ খারাপ হয় না, যদিও আমাদের সমাজে এটাই ঢালাওভাবে ভেবে নেয়া হয় আর শেখানোর চেষ্টা করা হয়। আমরা বিভিন্ন দেশের জেলখানার দাগী আসামীদের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে দেখিয়েছি যে, তাদের প্রায় সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাসী আস্তিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনোটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে নি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থাই এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। আল্লাহর গোনাহ কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিণত হতো। বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকই আল্লাহ-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটি পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারে নি। এ বইয়ে ব্যক্তিবিশেষের পরিসংখ্যান যেমন দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য বিশ্বে সুইডেন বা ডেনমার্কের মতো ‘প্রায় ধর্মহীন’ দেশগুলোর সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও সেসব দেশে পৃথিবীর অন্য অনেক জায়গার চেয়ে অপরাধপ্রবণতা কম, এবং সেখানকার নাগরিকেরা অনেক সুখী জীবন যাপন করছে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিসংখ্যান উপস্থাপনের পাশাপাশি এ বইয়ে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক ব্যাখ্যা হাজির করা হয়েছে; ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কখনোই সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিত। এধরনের অনেক গভীর রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং দার্শনিক আলোচনা বইটিতে স্থান পেয়েছে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। কাজেই আগেকার বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ধারা থেকে আমাদের বইটি অনেক দিক থেকেই স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ নতুন একটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস এবং ধর্ম নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছি বাঙালি পাঠকদের জন্য। আমরা মনে করি, এই আঙ্গিকে ঈশ্বর ও ধর্মালোচনা বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা এক ধরনের কুসংস্কার, এবং আমাদের মতে সবচেয়ে বড় কুসংস্কার। আর সে অপবিশ্বাসকে পুঁজি করে মানুষের আবিষ্কৃত ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থগুলোও অযৌক্তিক মতবাদে পরিপূর্ণ। অন্য সকল ধরনের কুসংস্কার, অপবিশ্বাস, অযুক্তিকে বধে যেমন আমরা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হই বিনা দ্বিধায়, তেমনি ঈশ্বর এবং ধর্মালোচনাতেও আমাদের অস্ত্র হতে পারে বিজ্ঞান। বিবর্তন তত্ত্ব থেকে শুরু করে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইতোমধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। যদিও অনেকেই ঢালাওভাবে বলে থাকেন, ‘ঈশ্বর সংজ্ঞায়িত নন’, কিংবা ‘বিজ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব কোনোটাই প্রমাণ করা যায় না’, কিংবা বলেন ‘ঈশ্বরের অনুপস্থিতি প্রমাণ করা গেলেও সেটা তার অনস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে না’ ইত্যাদি। এই বইয়ে আমরা দেখাবো স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয়া এই ধরনের প্রতিটি অনুকল্পই ভুল। আব্রাহামিক ধর্মের ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেক কিছুই খুব ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত। এ বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে তার অনেক বৈশিষ্ট্যই আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে ভ্রান্ত কিংবা যুক্তির কষ্টিপাথরে পরস্পরবিরোধী। তাছাড়া, আধুনিক বিজ্ঞান এখন যে জায়গায় পৌঁছে গেছে ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলে কোনো না কোনোভাবে বিজ্ঞানের চোখে তা ধরা পড়ার কথা ছিলো। যেসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকার কথা এতদিন আমরা শুনে এসেছি সেখানে তার অনুপস্থিতি অবশ্যই তার অনস্তিত্বের উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের কাছে। বিবর্তন তত্ত্ব রঙ্গমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত সকল ধর্মগ্রন্থের কল্যাণে আমরা জানতাম ঈশ্বর আদম-হাওয়ার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্মগ্রন্থের আয়াতসমূহে আল্লাহ বলেছেন তিনি আমাদেরকে এক আদি মানুষ আদম হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন আদমের হাড় থেকে<sup>11</sup>। আর অন্যদিকে বিবর্তন বলছে আদি এককোষী জীবের

11 বাইবেলে তো আছেই (জেনেসিস ২:২১-২৫), সেই সাথে কোরান শরিফের ৪:১, ৭:১৮৯, ৩০:২০-২১, ৩৯:৬ প্রভৃতি আয়াত দ্রষ্টব্য। আর হাদিসে আছে সরাসরি :-

‘নারীদের প্রতি বন্ধুত্বমূলক আচরণ করা কারণ তাদেরকে বুকের হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে, বুকের বাঁকা হাড়, যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তবে তা ভেঙে যাবে; আর যদি তুমি কিছুই না করো, তবে সে বাঁকাই থেকে যাবে।’ (রুখারি এবং মুসলিম)

লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তিতরূপ বর্তমান মানুষ। বিবর্তন তত্ত্ব বহু আগেই প্রমাণ করেছে, খ্রিস্টান পাদ্রি জেমস আশারের ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির বাইবেলীয় গণনা কিংবা ২৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নূহের প্লাবনের কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, এই মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পেছনে আসলে কোনো ডিজাইন নেই, পরিকল্পনা নেই, নেই কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার সুমহান উদ্দেশ্য। মহাবিশ্বের উদ্ভব এবং প্রাণের উৎপত্তির পেছনে সুস্থিত প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা এখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই দেওয়া সম্ভব, যা পরীক্ষালব্ধ উপাত্তের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়া প্রার্থনায় সাড়া দেওয়ার পরীক্ষাসহ বহু পরীক্ষায় ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়ার কথা থাকলেও সে ধরনের কিছুই কখনো পাওয়া যায়নি। ঈশ্বর আজ আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে একটি ‘ব্যর্থ অনুকল্প’। আমাদের চারপাশের জগতে অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। একটা সময় প্রাণের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য আত্মার শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো মানুষকে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে ঈশ্বরের মতো আত্মাও একটি বাতিল অনুকল্প। বইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়ে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনায় বলা হয়েছে, মানুষের অনুভূতি, জন্ম- মৃত্যু থেকে শুরু করে জগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, আত্মার মতো অতিপ্রাকৃত কোনো কিছু আমদানির দরকার নেই।

ঈশ্বর অনুকল্পের পাশাপাশি এসেছে ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার বিষয়টিও। শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর বিভিন্ন আয়াত বা শ্লোককে বিভিন্ন চতুর অপব্যাক্যার মাধ্যমে ইদানীং আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মানুষজনকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। মরিস বুকাইলি থেকে শুরু করে হারলন ইয়াহিয়া, জাকির নায়েক এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শমশের আলীসহ আধুনিক বিরোধিতাবাদের বিভিন্ন অপব্যাক্যার জবাব দেয়া হয়েছে বইয়ের ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ অধ্যায়ে। একই অধ্যায়ে রাশাদ খলিফা বর্ণিত কোরআনের তথাকথিত উনিশ তত্ত্বের নির্মোহ বিশ্লেষণ সংযুক্ত হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি কীভাবে রাশাদ খলিফা কোরআনের আয়াতে ইচ্ছেমতো নিজস্ব সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে অর্থাৎ কোরআন টেম্পারিং করে নিউমেরোলজি বা সংখ্যাতত্ত্ব নামক অপবিজ্ঞানের সাহায্যে কোরআনকে অলৌকিক গ্রন্থ বানাতে চেয়েছেন।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নতুন কোনো ঘটনা নয়, এটি চলছে হাজার বছর ধরে। কিন্তু বিজ্ঞানের উপকার গ্রহণে আমরা যতটা না আগ্রহী তারচেয়ে বেশি আগ্রহী বিজ্ঞানের চেতনা পরিহারে। কিন্তু আমরা, নতুন দিনের নাস্তিকেরা উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া অযৌক্তিক বিশ্বাসকে সামান্যতম শ্রদ্ধা দেখাতে রাজি নই। আমরা মনে করি, ধর্মীয় বিশ্বাস আসলে অপবিশ্বাস যা সমাজের শান্তি বিনষ্টকারী এবং সেইসাথে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা রোধের প্রধানতম অন্তরায় ছাড়া আর কিছু নয়। ছোটবেলার মগজধোলাইয়ের কারণে সমাজের বেশিরভাগ মানুষই মনে করে থাকেন, জীবনে শান্তি, পবিত্রতা এবং আনন্দ বজায় রাখার জন্য ধর্ম জরুরি। তাদের এই অনুভূতি আমরা কেড়ে নিতে চাই না, তবে আমরা দেখাতে চাই, ধর্ম বিশ্বাস ছাড়াও জীবন একই রকম কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও বেশি নৈতিক, আনন্দ এবং পরিপূর্ণতায় ভরা হতে পারে। অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের উক্তি দিয়েই বলি- ‘You can be an atheist who is happy, balanced, moral and intellectually fulfilled.’ এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে বইটির শেষ তিনটি অধ্যায়ে।

২০০৪ সালে স্যাম হ্যারিসের লেখা ‘বিশ্বাসের সমাপ্তি’ বইটির মাধ্যমে পাশ্চাত্যে সূচনা হয় নতুন এক আন্দোলনের<sup>12</sup>। পরবর্তীতে রিচার্ড ডকিন্স, ভিক্টর স্টেঙ্গার, ড্যানিয়েল সি ড্যানোট এবং ক্রিস্টোফার হিচেক্সের মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা আরও ছয়টি দুনিয়া কাঁপানো বইয়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। উল্লেখিত নাস্তিকদের প্রতিটি বই আমেরিকায় বেস্ট সেলার হয়েছে, যা কিছুদিন আগেও ছিলো অকল্পনীয়। এই আন্দোলন পাশ্চাত্যে পরিচিত হয়েছে নতুন দিনের নাস্তিকতা (নব্য নাস্তিকতা বা New Atheism) হিসেবে। বাংলায় এখনো সে ধরনের কোনো আন্দোলন

12 Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton, 2004

চোখে পড়েনি, যদিও আমরা প্রায়ই নিজেদের প্রবোধ দিতে উচ্চারণ করি যে, আমাদের সংস্কৃতিতে বস্তুবাদিতার উপাদান অনেক প্রাচীন। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে নতুন দিনের নাস্তিকতা আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করার জন্যই আমাদের এই বই। সকল ধরনের অপবিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। আশা করি, এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারব যে, নতুন দিনের নাস্তিকতাই একজন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য আজ অবশ্যস্বাবী ও শক্তিশালী একটি যৌক্তিক অবস্থান। আমরা আরও আশা করি বাংলাদেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদীরা এই আন্দোলনে শরীক হবার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে কুসংস্কার দূরীকরণে এগিয়ে আসবেন। সেটা কেবল মাত্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনেই আমাদের সাহায্য করবে না, সাহায্য করবে কউর ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে। রক্ষা করবে, ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা প্রতিক্রিয়াশীল মহলের স্বাধীন বাংলাদেশকে আরেকটি ছোট পাকিস্তান কিংবা তালিবানি আফগানিস্তান বানানোর অপচেষ্টা থেকেও।

আমাদের জীবন দীপান্বিত হোক!

অভিজিৎ রায় (charbak\_bd@yahoo.com)

রায়হান আবীর (raihaan1079@gmail.com)

ফেব্রুয়ারি, ২০১১